ডেমোক্রেসি অব ফালু

আবারও বিএনপি লজ্জাজনক ইতিহাস সৃষ্টি করলো। গণতান্ত্রিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে একে একে ধ্বংস করছে, করেই চলেছে। বিএনপি যে গণতন্ত্রের কথা বলে সেটা কোন্ গণতন্ত্র? ঢাকা-১০ রাজধানীর শহরের মধ্যে। সমস্ত মিডিয়ার সাংবাদিকরা প্রতিদিনের কর্মকান্ডের খবর ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশ-বিদেশে। 'কুলা' প্রতীকের প্রার্থী মেজর (অবঃ) মান্নানকে নানাভাবে নাজেহাল করে, কর্মী সমর্থকদের দমন-পীড়ন করে, নির্বাচনের দিন প্রায় সমস্ত কেন্দ্র ক্যাডার-মাস্তান দিয়ে দখল করে যে প্রসহন করা হলো, সেসব কি গোপন থাকবে? ফালুকে বিজয়ী ঘোষণা, গেজেট প্রকাশের আগেই তড়িঘড়ি করে শপথের আয়োজন এবং অতিদ্রুত সংসদে যোগ দেয়া- এ সবই সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচনী তামাশায় ছিঃ ছিঃ লজ্জা ছাড়া আর কী বলবো? এর নাম দেয়া যায়- 'ডেমোক্রেসি অব ফালু'। গাজীপুর-২ আসনের উপনির্বাচনেও কি 'ফালু থিউরি' প্রয়োগ করা হবে?

রতন বসাক
সুরুজ, টাঙ্গাইল-১৯০০

কেবল বিপক্ষে হলেই কি অপরাধ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা?

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেলো, নির্বাচিত সরকার উৎখাতের জন্য 'জনতার মঞ্চ' মামলায় মহীউদ্দিন খান আলমগীরসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে (যুগান্তর, ১৭-০৫-০৪)। এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে বিগত সরকার বিরোধী আন্দোলনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ করে সরকার পতন নিশ্চিত করার জন্য, তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আহ্বানের কথা। সরকার পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ডাক ও উসকানি দিয়ে স্বয়ং খালেদা জিয়া তার প্রকাশ্য বক্তৃতায়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এই মর্মে আশ্বস্তও করেছেন যে 'এ কারণে কারো যদি চাকরি চলে যায়, তাহলে তিনি (খালেদা জিয়া) ক্ষমতায় গিয়ে তাদের সে সব চাকরি ফিরিয়ে দেবেন।' (সূত্র : ইত্তেফাক ০৬-০৫-০১)। এখন কথা হলো একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান যে কাজের জন্য দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আহ্বান জানাতে পারেন, তা আবার রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ হয় কি করে? আর যদি তা হয়, তা হলে তো একই অপরাধে স্বয়ং খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করা উচিত। একই অপরাধে মহীউদ্দীন খান আলমগীরের সঙ্গে খালেদা জিয়াকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। কেননা অপরাধের সংজ্ঞা তো মানুষ ভেদে, মানুষের অবস্থান ভেদে একেক রকম হতে পারে না।' 'পক্ষে হলে সব ঠিক আছে- আর বিপক্ষে হলেই অপরাধ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা' আইন কোনো দিন তা বলবে না।

আবুল হাসেম
ত্রিপলি, লিবিয়া

শ্রদ্ধেয় আলী যাকের এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ...

জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৪ জুন সংখ্যায় 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে বিভ্রান্তি' শীর্ষক আমার একটি চিঠি ছাপা হয়। তারপর ১৬ জুলাই ২০০৪ সংখ্যায় শ্রদ্ধাভাজন নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের উক্ত লেখাটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ধন্যবাদ তাঁকে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণদান শেষে বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা বলে ছোট করে জিয়ে পাকিস্তান বলার বিষয়টিকে 'অলীক' অভিহিত করে আলী যাকের লিখেছেন- ৭ই মার্চ সংক্রান্ত বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয়েছে কবি শামসুর রাহমান লিখিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'কালের ধুলোয় লেখা'য় উদ্ধৃত একটি তথ্যের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে এই 'বিভ্রান্তিটি'র উদ্ভব শামসুর রাহমান করেননি; অনেক আগ থেকেই তা হয়ে আছে। বুঝতে পারছি না- আলী যাকেরের মতো বোদ্ধা ব্যক্তির তা অজানা থাকে কী করে? রাজনীতি সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন, কবি শামসুর রাহমান আওয়ামী লীগের বিরোধী লোক নন। ২/১টি পত্রিকা কবিকে 'আওয়ামী বুদ্ধিজীবী' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। সেই তিনি আওয়ামী লীগ তথা স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেবেন এমনটি ভাবা যায় না। তাছাড়া তিনি কোনো নোংরা রাজনীতিক নন; একজন কবি, একজন শুদ্ধ মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কালের ধুলোয় লেখা আত্মজীবনীটি প্রথমে দৈনিক জনকণ্ঠে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে। পরে তা গ্রন্থাগারে রূপ নেয়। তখন কথিত এই বিভ্রান্তিটি নিয়ে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মী কোনোরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি জানাননি। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীর পত্রিকা ভোরের কাগজে গ্রন্থালোচনায় আত্মজীবনীটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তাতে সমালোচক ৭ই মার্চের উল্লেখিত তথ্যটি জানানোর জন্য কবিকে সাধুবাদ জানান! এছাড়াও ২১ মে ২০০৪ সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০-এর ফোরাম পাতায় ২০০০-এর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন- বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে জয় বাংলার পাশাপাশি জিয়ে পাকিস্তানও বলেছিলেন এবং তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আছে। শ্রদ্ধাভাজন আলী যাকের, দুঃখিত, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে। ধন্যবাদ প্রিয় পত্রিকা ২০০০। ধন্যবাদ প্রিয় মানুষ আলী যাকের।

শফিকুল ইসলাম, পাহাড়তলী বাজার, চট্টগ্রাম

প্রতিহিংসামূলক মামলা

নিজের পৈতৃক সম্পত্তির ওপর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মাজারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণে ৪১ লাখ টাকার কন্সালটেন্সি খরচের জন্য যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে জিয়ার কবরের জন্য অতি মূল্যবান সরকারি সম্পত্তির ওপর, তাও আবার স্বেচ্ছাচারীভাবে বিশ্ব বিখ্যাত লুই কানের মাস্টার প্ল্যানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ও পরিবেশ নষ্ট করে অসংখ্য গাছ নিধন করে নির্মিত সৌধ দুর্নীতিমুক্ত হচ্ছে কিভাবে? দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকার গম কেলেঙ্কারি, জেট ফুয়েল কেলেঙ্কারি, অস্ত্র কেলেঙ্কারি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্টে নকল মুদ্রা প্রাপ্তির হোতারা দুর্নীতি থেকে পার পেয়ে যাচ্ছে আর এয়ার মার্শাল (অবঃ) জামালউদ্দীন তার অধীনস্ত একজন অতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীর ঘড়ি ছিনতাইয়ের মামলা, আর এক প্রতিষ্ঠিত কোটিপতি ব্যবসায়ী ও সাবের চৌধুরীকে 'থালা-বাসন' চুরির মতো হাস্যস্পদ মামলায় ফাঁসাতে গিয়ে, ভাবমূর্তি পাগল জোট সরকার দেশের ভাবমূর্তিরই বারোটা বাজানোর ব্যবস্থা করেছেন। 'অতি সম্প্রতি সরকার গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে দুটি জরাজীর্ণ এফ-২৮ কেনার ৭২ ঘন্টার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ায় ফ্লাইট শিডিউল ভেঙে পড়েছে।' এ খবর প্রমাণ করে, কি পরিমাণ দুর্নীতি এতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কত লোকসান এতে গুণতে হবে।

রেল ভ্রমণ

'৪৭-এর সময় রাষ্ট্র কাঠামোর হাতে যে সম্পদ ছিল, তার মধ্যে একটি রেলওয়ে। এ প্রসঙ্গে আমার এক নেপালি বন্ধু বলেছিল, আমাদের দেশে রেললাইন করেনি রাজারা, আর বোধহয় সম্ভবও নয়।
রেলওয়ের জন্য বড় বড় ব্রিজ তৈরি হয়েছিল। পুরো দেশের একটি চেহারা পাওয়া যেতো। কিন্তু '৭১-এর পর রেলওয়েকে, রেলওয়ের পুরো কাঠামোকে ধ্বংস করা হলো। আপনাদের ২৩ জুলাইয়ের প্রচ্ছদ পুরো বিষয়টি তুলে ধরেছে। যা ছিল তাই নিয়ে আমরা না এগিয়ে একটি ভেঙে অন্যটি গড়েছি। এতো রাস্তা লাগতো না, যদি রেলওয়েকে কেন্দ্র করে এগুলো নির্মাণ হতো। যেমন ঈশ্বরদীকে বা কুড়িগ্রামকে কেন্দ্র করে উত্তরাঞ্চলে কিছু ছোট রাস্তা হতো, হতে পারতো লাকসামকে কেন্দ্র করেও। অর্থাৎ রেলওয়ে হাইওয়ে সমন্বিতভাবে তৈরি হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চাপ পড়তো না, দেশের বারোটা বাজতো না। কোলকাতায় বাসে না গিয়ে ট্রেনেই যাওয়া যেতো, অথবা দুটোই, যেমন ইউরোপে চলছে। অবাক লাগে এটা ভেবে যে, একটি নিরাপদ কমিউনিটি ভ্রমণকে আমরা কিভাবে শেষ করে দিয়েছি।

ইব্রাহিম খান
আখাউড়া

কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এ ব্যাপারে দুর্নীতি মামলা করা হবে কি? জোট সরকার দুর্নীতি দমনে আন্তরিক হলে নৌপরিবহনমন্ত্রী, যোগাযোগমন্ত্রী, ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, জ্বালানি, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে নানাবিধ দুর্নীতির ঘটনা চাপা দেয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু দেখা যায়, মন্ত্রী-এমপিদের দুর্নীতির বিষয়ে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ধমক খেতে হয়। তাই দেখা যায়, দুর্নীতির ব্যাপারে সরকারি দলের জন্য একরকম নীতি ও বিরোধী দলের জন্য অন্যরকম নীতি- যাতে জঘন্য প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্রই ফুটে ওঠে! চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ও মূল্যবান সার্কিট হাউসকে 'ছেড়া গেঞ্জি ও ভাঙা স্যুটকেস রাখার জন্য' জাদুঘর বানাতে যাদের বাঁধেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সাড়া জাগানো আগরতলা মামলায় আসামি হিসেবে আটক ছোট ঘরটিকে জাদুঘর বানানোর ফলে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে খোদ তৎকালীন প্রধান সেনাপতি ও মুক্তিযুদ্ধের জে. মোস্তাফিজকে দুর্নীতি মামলায় জড়িয়েছে। এ ধরনের কর্মকান্ড চলতে থাকলে দুর্নীতি দমন বিভাগ তাদের ওপর ন্যস্ত কাজ বাদ দিয়ে এসব প্রতিহিংসামূলক মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাতে আসল দুর্নীতিবাজরা রেহাই পেয়ে যাবে।

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার
সেগুন বাগিচা, ঢাকা

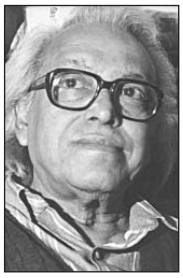

ক্ষমাপ্রার্থী আমার ত্রুটির জন্যে

শামসুর রাহমান

আমি খামোকা কথা বাড়াবো না। বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণ নিয়ে সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ কয়েকটি চিঠি ছাপা হয়েছে। এই চিঠিপত্রের মধ্যে আমার নামও উচ্চারিত হয়েছে। প্রিয় বন্ধু আলী যাকেরকে ধন্যবাদ, তিনি আমার একটি বড় রকমের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন তার একটি ছোট কিন্তু চমৎকার লেখায়। তিনি সেই লেখায় বলেছেন, "'৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভের পর বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সব সদস্যকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই এক বিরাট মঞ্চের ওপর জনসমক্ষে এক শপথবাক্য পাঠ করান। এই শপথবাক্যের পর তিনি একটি যার শেষে তিনি বলেছিলেন, 'জয় বাংলা', 'জয় পাকিস্তান'।"
আমি, কবুল করছি, দুই সময়ের সম্পূর্ণ দুটি আলাদা বক্তৃতার বক্তব্য এক মনে করে গুলিয়ে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, 'না আলী যাকের আমি দুই সভার কোনোটিতেই সশরীরে হাজির ছিলাম না। প্রথম বক্তৃতাটি আমি একটি চায়ের দোকানে ব'সে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনেছিলাম। কোনোকালেই আমি বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার ধৃষ্টতা দেখাইনি, কোনও সভায় কোনও উচ্চারণে তো নয়ই, এমনকি মনে-মনেও নয়। আমি তো ভালো করেই জানি, তাঁর অবদানের কল্যাণেই আমরা আজ একটি স্বাধীন দেশের বাসিন্দা।
আর আমার এই ভুল ত্রুটির জন্যে, সকল বঙ্গবন্ধুপ্রেমী ব্যক্তির কাছে আমি লজ্জিত, নিজের কাছে তো বটেই।

তিস্তা ব্রিজটির আধুনিকায়ন

লালমনিরহাট জেলার তিস্তায় অবস্থিত তিস্তা ব্রিজটি অত্র এলাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রাচীন আমলে তৈরি এবং কাঠের পাটাতনে আচ্ছাদিত। দৈনিক শত শত যানবাহন চলাচল করে এ ব্রিজ দিয়ে। এতে যানবাহনসমূহের বেশ অসুবিধা হয়। বিশেষ করে বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল আরোহীদের। যেকোনো সময় রেললাইনের ফাঁকে ঢুকে যেতে পারে। এ সামান্য জায়গাটুকুতে রেললাইনও স্থাপিত। পথচারী পারাপারে কোনো রাস্তা না থাকায় বাস বা ট্রেন চলে এলে পথচারীকে দৌড়ে 'এক্সটেনশনে' গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। একটি মাত্র চলাচলের রাস্তা হওয়ায় একপাশে গাড়ি থামিয়ে অন্য পাশ থেকে গাড়ি চালানো হয়। এতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিছুদিন আগে এমনি একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমরা এর পুনরাবৃত্তি চাই না। তাছাড়া ব্রিজটির ওপর শেড থাকায় হালকা ওজনের উঁচু কোনো জিনিস পারাপার করা যায় না, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং বিরক্তিকর। ব্রিজটিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় ব্রিজটিকে আধুনিক ব্রিজে রূপান্তরের জন্য রেললাইন আলাদা, পথচারী পারাপারের রাস্তাও আলাদা, ওপরের শেড বাতিল করাসহ আধুনিকীকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে আমি মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী, স্থানীয় উপমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মৌসুমী রহমান আল্পনা, আর কে মিশন রোড, লালমনিরহাট

৭ই মার্চের ভাষণ

১৬ জুলাই পাঠক ফোরামে আলী যাকের ঠিক বলেননি। হয় ওনার কাছে এতো বছর পর ঐ জনসভার স্মৃতি, ওনার ভাষায় ধূসর হয়ে গেছে, না হয় উনি এ ধ্রুব সত্যটিকে এড়িয়ে যেতে চান। বরং উনি বঙ্গবন্ধুর দুটি ভাষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান'। আমি নিজ কানে সেটা শুনেছি। যদিও আমি আলী যাকেরের মতো একজন সেলিব্রেটি নই। আমি বিশাল এ জনগোষ্ঠীর অতি সাধারণ একজন। একজন আলী যাকের বা একজন হুমায়ূন আহমেদ কোনো বিষয়ের ওপর কলম ধরলে সবাই তা সেভাবে গ্রহণ করে, একজন অতি সাধারণের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবুও ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে আমি লিখছি।
আমার পিতার সরকারি চাকরির সুবাদে আমরা তখন কুষ্টিয়া শহরে ছিলাম। আমি কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। তবে তখনকার রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। এরপর এলো সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের দিনটি। বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন যা সরাসরি সম্প্রচার করবে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র। বিকেলে আমার পিতাসহ পরিবারের সবাই অধীর আগ্রহে রেডিওর সামনে অপেক্ষা করছি এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শোনার জন্য। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ভাষণ আর প্রচারিত হয়নি। ইতিমধ্যে সব ধরনের নিয়মিত রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। ঐ রাতে সবাই উদ্বেগের মধ্যে কাটালাম। পরদিন সকালের দৈনিক পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে, পাকিস্তান সরকার ঐ ভাষণ সম্প্রচার না করার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিবাদে রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। তারা শর্ত দেয় যে বঙ্গবন্ধুর ধারণকৃত ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিলেই কেবল ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। সরকার বাধ্য হয়ে সে শর্ত মেনে নেয় এবং সম্ভবত পরদিনই সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারিত হয়। আমরা সবাই পিনপতন নীরবতায় সে ভাষণ শুনেছি এবং শিহরিত হয়েছি। কিন্তু ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান', আমি তখন একটু অবাকই হয়ে যাই। এ জ্বালাময়ী ভাষণের পর আবার 'জয় পাকিস্তান' বলা কেন! তখন ঐ বয়সে রাজনীতির কূটকৌশল হয়তো ততটা বুঝতাম না। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ ব্যাপারে আমার পিতাকে প্রশ্ন করি। উত্তরে আমার পিতা যে যুক্তি দিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন সেটা ছিল- যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান বর্তমান, সরকারেও পাকিস্তানি শাসকদল উপস্থিত, সেহেতু বঙ্গবন্ধু কৌশলগত কারণে 'জয় পাকিস্তান' বলেছেন। আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন বেশ ক'বছর আগে। কিন্তু তাঁর সেদিনের কথাগুলো এখনও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সুতরাং শুধু কবি শামসুর রাহমান বা কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদই নন, আমার মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষ ঐ ঐতিহাসিক ভাষণের সাক্ষী। যদিও এখন ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচারিত হয়ে থাকে 'জয় পাকিস্তান' অংশটুকু বাদ দিয়ে, সেটিও কৌশলগত কারণেই।

মইনুল ইসলাম তপন, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা

শুধু মন্ত্রী বিশ্বাসবর্গই সত্য বলেন

১ জুলাই হয়ে গেল ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন। হারিস চৌধুরী, মান্নান ভুঁইয়ার মতো নেতারা কিভাবে বলেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে রাজনীতি করেন বলে মিথ্যা বলতে বিবেকের কাছে একটু প্রশ্ন জাগে না? সাংবাদিকরা নাকি মিথ্যা বলে! পত্রিকার ছবিগুলো যেকোনোভাবে তোলা যায়- মন্ত্রিদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে সাংবাদিকদের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? সাংবাদিকদের কি দায় পড়েছে মিথ্যা বলতে? কোনো সাংবাদিক বা বিশিষ্ট লোক মারা গেলে মন্ত্রীরা বলবেন কি জানেন? এটা অতিরঞ্জিত লিখেছে। পত্রিকার ছবি যদি মিথ্যা হয়, তাহলে এমপি-মন্ত্রীরা যত সত্য কথা বলেন। দেশের মানুষকে কি এমপি-মন্ত্রীদের কথা বিশ্বাস করতে হবে?

মৌ
কাঞ্চনপুর, ঝিনাইদহ